ভূত

কি বাদামই হোত শ্রীশ পরামানিকের বাগানে। রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই।

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখালমাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুততলার স্কুল'।

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালালচক্রবর্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়রাসব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছেমতো মাঠে-বাগানেবেড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনো মাস্টারমশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবারছুটি।

সেদিনও এমনি হল।

রেল লাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মা—লার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেল লাইন বেড়িয়ে এলামঘণ্টাখানেক পরে এসেও দেখি এখনো হাঁড়ি-বেচা মাস্টারেরনাক ডাকচে।

নারাণ বললে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাস নি, চল ততক্ষণপরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বললামবাদাম পাড়া সোজা কথা ?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ সময়—

—চল তো দেখি—

এইবার সবাই আমরা মিলে পরমানিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের বেজায়বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ।এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ বাগানের সব অংশে যাই নি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্যন্তলম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনো কোনো গাছে। কিন্তু অসময়েরপেয়ারা তেমন বড় হয় নি। ফল আরো যদি কোনো রকম কিছুথাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললোই না, যা বা পাওয়া গেল, ইট দিয়ে

ঘেঁচে তার শাঁসবের করবার ধৈর্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমারছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

খস্ খস্ শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্ছে। কুল্লো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুকখুর বেলা—

ভূতে মারে ঢ্যালা—

ভূতের নাম রসি—

হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে। মন্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসবো ?কিন্তু ভূতের নামরসি হল কেন, শ্যামও হতে পারতো, কালো হতে পারতো, নিবারণ হতেই বা আপত্তি কি ছিল ?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপতার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের ঢিপ ঢিপ যেন হঠাৎ বন্ধহয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়াগাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনী।

ভালো করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরোবাগদিনীই বটে, সর্বনাশ !

সে যে মরে গিয়েছে !

বরো বাগদিনীর বাড়ি আমাদের গাঁয়ের গোঁসাই পাড়ায়।অশত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ি ঝি-গিরি করতো অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয় এই পর্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর ঘরে দেখা যায় না। মাস দুই আগের কথা।

একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারেবাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়ে ফেলেছে অনেকটা।সেই রকমই কালো রোগা-মতো দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বললে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো মরে গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে দিব্যিবসে।

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখনআমার গা ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে।

ছেলেরা বললে—কি হয়েচে রে ?অমন কচ্ছিস কেন ?আমি বললাম–ভূত।

—কোথায় রে ?সে কি ?দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কি রে ?তা কখনো হয় ?

—নিজের চোখে দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট বরোবাগদিনী—

দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন ?তোর মিথ্যেকথা—

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হল—কিন্তু সেই সময় দলেরচাই নিমাই কলু বললে, না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করেঅতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ মাস্টারদের ঘুম ভেঙেচে। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতেরবহর জানো তো ! সে ঠ্যালা সামলাবে কে ?আমি ভাই যাবোনা—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলেরদলের কৌতুহলমিটে গেলহাঁড়ি-বেচা-মাস্টারেরবেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চললো। আমিও চললাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেইভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারআমাদের শূন্য ক্লাসরুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারিকরছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে !খেলা ভাঙলো ?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙলো ?...কিন্তু সে কথা বলে কে ?তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাইএতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন রত্না ! অর্থাৎ আমি।এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল ?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়োসড়ো হয়েকাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার।আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে। কিন্তু শেষ অস্ত্রছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বললাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরাজানে। এই সর্ব পরামানিকের বাগানে বাদাম কুড়তে গিয়েভূত দেখেছিলাম——

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎফুটে উঠলো। বললেন—ভূত ?ভূত কি রে ?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর। কোথায় ভূত ?কি রকম ভূত ?

সবিস্তারে বললাম ! আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে।আমায় কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বললেসে কথা। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বললেন—শুনচেন দাদা ?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বললেন—কি ?

—ওই কি বলে শুনুন !রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখেএসেচে সর্ব পরামানিকের বাগানে।

—সর্ব পরামানিক কে ?

—আরে, ওই শ্রীশ পরামানিকের বাবার নাম। ওদেরইবাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ, —হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড়নেড়ে বলেন—তা হবে না ?অপঘাত মৃত্যু—গতি হয় নি—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক।অবিশ্বাসের সুর তখনো তার কথার মধ্যে থেকে দূর হয় নি।তিনি বললেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবেবাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে ?

—তাতে কি ?তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেখাপড়াকরেদিয়েচে নাকি ?তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি।

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে সমর্থন করলে।

রাখাল মাস্টার বললেন,-হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূততোমাদের জন্যে সেখানে এখনো বসে আছে কি না ?ওরাহল কি বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানেবিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বললেন—চলুন না দেখে আসি গিয়েকি রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কি ?

আমরা সকলেই তো এই চাই। এঁরা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

যাওয়া হল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চললো মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদেরসকলকে। যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা কখনো ভুলবো না—এতবৎসর পরেও সে দৃশ্য আবার যেন চোখের সামনে দেখতেপাই এখনো।

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়েপৌঁছলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই।

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধকাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধভাঁড়টাক জল।একরাশ আমড়ার খোসা ও আঁটি জড়ো হয়েছে পাশে —কতকটাটকা, কতক কিছু দিন আগে খাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলেরছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরেপড়ে আছে। খানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ সমস্যার কোনো মীমাংসা হয় নি।

আমরা হৈ হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্যচৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ?কেউ বললে ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বললে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ওসম্ভবত আশ্বিন কার্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটুজলও দেয় নি তার মুখে।

কে-ই বা দেবে এ জঙ্গলে ?জানতোই বা কে ?

বরো বাগদিনীর এ আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেইপরপারে চলে গেল।